

বাংলা

কলকাতা যে একদিন লন্ডন হবেই, তা নিশ্চিত। কারণ, বাংলা প্রায় বিলিতি হয়ে গিয়েছে। তার নতুন বোতলে এখন নতুন মদই। সে বোতলের গায়ে বর্ণময় স্মার্ট লেবেল। কাস্টমার কেয়ারের নম্বর। বারের কোড অব কন্ডাক্ট নয় বটে, তবে বার-কোড উজ্জ্বল। কুঠার ঘোমটা সরিয়ে শহরের সুউচ্চ হোর্ডিং আর মিনিবাসের পশ্চাদ্দেশ তার বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ। কোথাও সচিত্র বাংলার ‘বাঘ’, আর ক্যাপশন : ‘জবরদস্ত তেজ!’ কোথাও কার্টুনের ঢঙে জোড়া-ঘুসি, সঙ্গে সদস্ত উচ্চারণ : ‘দাদা — বাংলার জোশ’। ছোট্ট হরফে, এক কোণে বিলিতির বিজ্ঞাপন-সুলভ ‘মিউজিক সিডি’ কিংবা ‘প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার’ বিলক্ষণ হাজির। তবে কিনা নেহাত রসিকজন না হলে হালফিলের এই বিমূর্ত বিজ্ঞাপনের মর্মোদ্ধারে ব্যথা আছে।

এক কালে ‘ঝটকা’, ‘অমানুষ’, ‘তীরধনুক’ এ সব চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে দু-দশটা নয়, এ রাজ্যে ‘বাংলা’ বা সরকারি দেশি মদের এমন চালু ব্র্যান্ড শতাধিক। কেউ ‘বেঙ্গল’ স প্রাইড’ তো কেউ ‘বেঙ্গল টাইগার’। ‘ব্ল্যাক লেবেল’ নেই, কিন্তু ‘ব্লু লেবেল’ আছে। ‘ভ্যাট 69’ নেই, ‘ভ্যাট 70’ আছে। কাব্যিক ‘পলাশ’ আছে, হিমালয়ান ‘টুকটুক’ আছে। এমনকী গন্ধী-ভদকার আদলে মিলছে ফ্লেভারড বাংলাও— লেবুর গন্ধমেশা ‘ক্যাপ্টেন নিম্বু’, কমলায় ম-ম ‘জেডি অরেঞ্জ’! একান্তই নিবেদিতপ্রাণ ব্যতিক্রমী ছাড়া বঙ্গজীবনের অঙ্গ বাংলা মদের এই ভোলবদলের আপডেট উচ্চবিত্ত বাঙালির কাছে তো নেই-ই; উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, এমনকী নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালিও এ ব্যাপারে কিস্যুটি জানে না। বাংলাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন তুমুল নিম্নবিত্ত ও বেসিক আঁতেলরা। তাঁরা জানেন, ‘ভাল অবস্থায় ফেরতযোগ্য বোতলের দাম ৫.০০ টাকা’ হলেও তিন টাকা নিদেনপক্ষে জুটতই। গত ১ জুন থেকে সে গুড়-জলে বালি! রি-সাইক্লিং বন্ধ। এ সম্ভবত কাচ থেকে পুরোপুরি প্লাস্টিকের দিকেই ধেয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত। তাঁরা আরও জানেন, ইতিহাসের সব পরিবর্তনই আসলে সাম্প্রতিক। নবান্নের ধান, নবান্নেরই দান। নবান্নের চালও, নবান্নেরই চাল— তাঁরাই বলছেন! সে চালে কিস্তি হয়, পালটা খিস্তিও হয়। এ কথা ঠিক, বাংলার অভিধানে এখন আর বেমক্কা খোয়ারি নেই, ঝুপ করে নেশা পড়ে মাথা-ধরা নেই, ভকভকে গন্ধ বেরোনো অস্বস্তি নেই। কিন্তু সফিস্টিকেশনের এই সব চক্ররে, জমাটি নেশাটাই নাকি হাওয়া। পাঁচ-সাত বছর আগেও দেখেছি, লিকার যেন ডিগবাজি খায়! প্রাথমিক কিক-ই ছিল সেই ‘ফারিনি’ ব্র্যান্ডের ইউএসপি। আরও আগে শুনেছি তিন রকম দমের বাংলা মিলত, ধক না থাকলে ১ নম্বর গলা-ফলা জুলিয়ে দিত। আর আজ লাইনে দাঁড়িয়ে পাবলিক হাহুতাশ করছে, ‘গ্যাস, পাতি গ্যাস পোরা— আগে হাফ পাইটে যা কাজ হত, এখন দেড় বোতলেও হচ্ছে না, মাইরি!’ ফিফটি, সিক্সটি, এইটি... ডিগ্রি যতই আপে উঠুক না কেন, আবগারি আয় বাড়াতে গিয়ে বাংলার বোতলময় কি তাহলে শুধুই বাংলার বায়ু, বাংলার জল!

খবর বলছে, ২০১৪-' ১৫ অর্থবর্ষে বাংলা মদের বিক্রি বেড়েছে ২০%। মোটেই বিলিতি নয়, আবগারি দফতরের লক্ষপূরণ হয়েছে বাংলার হাত ধরে। ২০১১-' ১২ সাল থেকেই দেশি মদে সরকারের আয় চড়চড়িয়ে বেড়েছে। ২০১২-' ১৩ আর্থিক বছরে তো তার আগের বছরের চেয়ে প্রায় ৫৬% রাজস্ব বেড়েছে স্রেফ দেশি মদের কারবারেই। অথচ বিলিতিতে যে বৃদ্ধিটা মোটে ১০%-এরও কম। তার মানে, বাংলা লোকে টানছেও হু হু করে! সরকারি রিপোর্টই বলছে, ২০১২-' ১৩ অর্থবর্ষে বাংলা খাওয়ার হার বেড়েছে আগের বছরের চেয়ে ২৫%। কী উপায়ে? শুধুই মার্কেটিং? নাকি, বেশির ভাগ লোককে সত্যিই জল না মিশিয়ে র ' মেরে দিতে হচ্ছে! বাধ্যত।

তবু, এন্ড অব দ্য ডে, বাংলাকে কেউ দাবায়া রাখতে পারবা না। মালের টেম্পার কমিয়ে বাঙালিকে রাখা যায় না। যায়নি। ইংরেজ পারেনি, সিপিএম-ও পারেনি। বাঙালি আজন্ম ক্রিয়েটিভ। নিরীক্ষা তার বন্ধু। তার জুতোর নাম হয়তো অবিমৃশ্যকারিতা, কিন্তু বাঁ হাতের খেলার নামও ইমপ্রোভাইজেশন। ককটেল-মকটেল আজগুবি শব্দ না আউড়িয়ে সে জোলো বাংলায় সিম্পলি এটু জলজিরা মিশিয়েই করে নেবে উৎকৃষ্টতম। কিংবা মুখের মধ্যে গুঁজে রাখবে আধ কোয়া কমলালেবু, তার পর চুকচুক টেনে যাবে স্রেফ। যাঁরা বাংলায় মজেছেন, উদ্ভাবনীশক্তিতে নিঃসন্দেহে তাঁরা আর পাঁচ জনের চেয়ে গ্যালন্স অ্যাহেড। আজ নয়, পানীয়টিকে নিজের মতো কাস্টমাইজ করে নিয়ে খেলিয়ে খাওয়ার এই পানপ্রথা বহু দিনের। সেই কবে, কমলকুমার মজুমদার খালাসিটোলায় বসে (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে ঠায় দাঁড়িয়ে!) বাংলায় ঠোট ভেজাতেন আর মাঝেমাঝে নাকি পকেট থেকে বের করে মুখে দিতেন ছোট এলাচ। সেটা মোটেই রাম ও রামায়ণের যুগ ছিল না, কিন্তু কৃতিবাসের যুগ ছিল বটে। বাংলার তারল্যেই তখন বাঁক খুঁজছে বাংলা ভাষা। কল্পবাজারে সন্ধ্যা নামলে আজও ইমপ্রোভাইজেশনেই ভরসা রাখেন বেআইনি বাংলা বিক্রেতা। বাংলাদেশের এ সব এলাকায় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিরামিষ এনার্জি ড্রিংকের বোতলে বাংলা পুরে প্রকাশ্য কেনাবেচা খুব অচেনা ঘটনা নয়। কিংবা এ পারের ক্যানিং। স্টেশন চত্বরে দাঁড়িয়ে বিশ-পঁচিশ টাকা খসালেই আপনার হাতে এসে পড়তে পারে আপাত নিরীহ একটি ডাব। অতঃপর চমক মিলবে চুমুকে! সুকৌশলে ভেতরের জল অর্ধেক বের করে, তার বদলে পুরে দেওয়া হয়েছে বিশুদ্ধ বাংলা। কারবারটি বেআইনি, কিন্তু মিশ্রণটি স্বর্গীয়!

বাংলার সঙ্গে এটাসেটামিক্স করে জাদুপানীয় হামেশাই তৈরি হয়ে থাকে। শুনেছি, ঋত্বিক ঘটকের পেয়ালায় নাকি লিকার চা মিশত কান্ট্রি লিকারের সঙ্গে, আধাআধি রেশিয়ো-য়। ইনফিউশন আর বাংলার অনুরূপ ফিউশন তো দেখেইছি শান্তিনিকেতনে। প্রাদেশিকতার বোধ কম বলেই বোধহয় বিশ্বকবির শান্তিনিকেতনে কিছু বন্ধু এমনই আর একটি পানীয়ের ডাকনাম দিতে পেরেছিলেন ' বাংলা-বিহার '। মিশ্রণটি হত বাংলা আর বিহারের। স্বাদে বিচিত্র, নেশায় আক্ষরিক ভাবেই অভূতপূর্ব! ' গল্প হলেও সত্যি ' -র চাকর ধনঞ্জয়ের উপদেশটি এক বার স্মরণ করুন... ' এলিট ' অনুপান সোডা যে ধেনোর সঙ্গেও বিলক্ষণ যায়, তা বড়বাবুকে বুঝিয়ে দিচ্ছে সে। এ-ও বলছে, ' অল্প করে ডালমুট দিয়ে খান, অম্বল হবে না ' - মানে, ভিষ্টোরীয় খোয়ারি ও ব্রান্স গাঁটামির জেরে পিপাসার্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি বাধ্যত জানলা বন্ধ করে ঘরের ভেতরেই যে উদ্-যাপনটুকু এত দিন সেরেছে,

সেটুকুও যে বেশ তরিত করেই করা যায়, সম্ভবত সে পথই বাতলাতে চাইছে। তবে দেশি মদের সঙ্গে চাটের শ্রেষ্ঠ ইনোভেশনটি দেখিয়েছেন ‘নিশিপদ্য’-র নটবরবারু (জহর রায়)। ফুচকার ভেতরে তেঁতুলজলের বদলে কালীমার্ক! এই বৈচিত্র্য আজও বাংলার বিন্দুতে বিন্দুতে। নেহাত কড়ি খসালেই, সুস্বাদু কিংবা স্পাইসি রাঁধলেই যে কোনও চাট তার সঙ্গে যোগ্য সংগত করতে পারে না। খেলা জমতে গেলে পাঁঠার ঝাল চর্বিই লাগবে, অথবা কচকচে ফেপরাচুস্তা। কিংবা, ঐশ্বরিক ‘মাচ্ছু’ – প্রকৃত প্রস্তাবে যা ‘মাছ-চুর’ – ধাবায় সারা দিনের অবিক্রিত মাছগুলিকে ঝোল থেকে তুলে, খেঁতলে, ফের ভেজে, পেঁয়াজ-রসুন-লংকায় পুনর্জীবিত করে এক অনবদ্য পরিবেশন! শ’দেড়েক বছর আগের বাঙালি বাবুয়ানিতেও দিশির সঙ্গে চাট বলতেই উঠে আসছে পাঁঠার মেটে কিংবা বেগুনি, পেঁয়াজির মতো তেলেভাজার কথা। পক্ষীর দল হোক বা থিয়েটার ক্লাব, উনিশ শতকের সে মেনুতে বড় একটা বদল হচ্ছে না। টেকচাঁদ ঠাকুরও ‘মদ খাওয়া বড় দায়’-তে ধেনোর চাট হিসেবে ‘বেগুনি, ফুলুরি, চাউলভাজা, ছোলা ভাজা’-র তালিকা দিচ্ছেন। তবে, মদের চাটের সব থেকে ভয়ংকর নিদর্শন উঠে এসেছে ১৮৮৩ সালে ছাপা বনোয়ারীলাল গোস্বামীর ‘কার মরণে কেবা মরে মলো মাগী কলু’ প্রহসনে। সেখানে শবানুগামী বাঙালিবাবুরা মদ সহযোগে ঝলসানো শবদেহটি কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে! তার পর এক পথচলতি কলু বউকে হত্যা করে, পুড়িয়ে, তাই দিয়েই চাট বানাচ্ছে। এই কাহিনি কোথাও যেন দিশি কারণবারির সঙ্গে শাক্ত ও অঘোরী যোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ‘ক্যালকাটা গেজেট’ এই পানাহারের বৃত্তান্ত নিয়ে লিখছে– ‘আ রিভোল্টিং স্টোরি, রিলেটেড উইদ দ্য ভিউ অব কনডেমিং অ্যান্ড শোয়িং দ্য ইভিলস অব ডার্কনেস অ্যামং এডুকটেড বেঙ্গলিজ।’

বাংলার ইতিহাসে জুড়ে রয়েছে এমনই বিচিত্র সব ঘটনা। এক চমৎকার কাহিনি শুনিয়েছেন অরুণ নাগ, ‘সেকালের নেশা’ প্রবন্ধে। একেবারেই নিম্নবিত্তের দেশি মদের পানশালাতেও সে যুগের বাবুদের যেতে হত বাধ্যত; রেস্ট-য় টান পড়লে। পরিচয় গোপন রাখতে তখন তাঁরা মুখে-মাথায় চাদর জড়িয়ে নিয়ে ঢুকতেন। আর তার পর স্যাট করে মেরে দিতেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। এহেন প্র্যাকটিসের নামটিও ছিল খাসা– ‘দাঁড়াভোগ’! কলেজ জীবনের শুরু থেকে এর কাছাকাছিই অভিজ্ঞতা হয়েছে বহু বার। ঘরেও নহে, বারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে... তার ভরসা মিনারেল ওয়াটারের বোতল। তখন বাড়িতে খাওয়ার সুযোগ নেই, পানশালাতে ঢোকারও পয়সা নেই। কাজেই খালি বোতলে জলবৎ তরলং ঢেলে নিয়ে ছাত্রসুলভ গোবেচারা ভঙ্গিতে হাঁটতে থাকা, কিংবা গ্রীষ্মের দুপুরে ফাঁকা বাসে উঠে পিছনের সিটে জানলার ধার দখল করা। তেষ্ঠা মিটলে টিকিট কেটে নেমে পড়া। সে নিষ্পাপ মুখ দেখলে কে বুঝবে ‘নির্লিপ্ত’ মানে আসলে ‘নীর-লিপ্ত’, ‘উদাসীন’ মানেও ‘উদ্-আসীন’! এই বোতল-পুরাণের একটা নামও দিয়েছিলাম আমরা। কনটেন্ট স্বচ্ছ বাংলা বা স্বচ্ছ রুশ (ভদকা) হলেও, এহেন ফর্মটির নামকরণে সে দিন ইংলিশেরই দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। ‘টেকনোলজি ফর ম্যানকাইন্ড’ – সাংকেতিক ভাষায় বন্ধুমহলে পানপদ্ধতিটি এ নামেই পরিচিত ছিল! সৌজন্যে, উঃ মাঃ পাঠ্যক্রমে সবে ফেলে আসা জে ব্রোনোউস্কি-র খণ্ডগদ্য।

বাঙালি জাতি অবশ্য সামগ্রিক ভাবে কখনওই বলতে চায়নি- সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। বাংলার ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে, সে হয় খিল্লির ঢঙে শরৎচন্দ্র কি মানিক বাঁড়ুজ্যে, কমলকুমার কি শক্তি, ঋত্বিকের নেম ড্রপ করেছে, অথবা খালাসিটোলা বা বারদুয়ারি-কে মিথে মাখোমাখো করে দূরবিন দিয়ে দেখেছে। পানীয় হিসেবে বাংলা কোনও দিনই বাঙালির কাছে ‘স্টেটাস’ পায়নি। চিরকালই থেকে গিয়েছে ‘লোয়ার ক্লাস’ গরিব-গুরবো মানুষের সস্তা পানীয় হিসেবে। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকেও যে দেশি ‘আরক’ পাওয়া যেত, তার কিছুটা হলেও কৌলীন্য ছিল বলে মনে হয়। কলকাতার কথা লিখতে গিয়ে কোম্পানির সাহেবরা যাকে বলছেন ‘বেঙ্গল আরক’। কলুটোলা, চিনাপট্টা, বউবাজারের মতো বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু ‘আরক হাউস’। যদিও ঔপনিবেশিক বাঙালি তত দিনে বিলিতির প্রতি ক্রমশ ঝুঁকতে শুরু করেছে। উনিশ শতকেও তার ধেনোকে ‘ধানেশ্বরী’ সম্বোধনের মধ্যে কি মিশে ছিল না বেশ খানিক শ্লেষের ছিটে! সে সময়ের ‘কলির হাট’ প্রহসনে দেখি চার মাতালের গান- ‘স্পীরিট না পেটে গেলে, স্পীরিট হবে না মোলে, সেম্ বাঙালির ছেলে নিগার নেসান...’। নেহাত পয়সায় টান না পড়লে, ক’জন বাঙালিবারু দিশিতে গলা ভেজাতেন, বলা মুশকিল। টেকচাঁদ ঠাকুর যেমন লিখছেন- ‘ভবানীবারু সকলকে ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠতে পারিলেন না, আপনি বিলাতি রকম খান, অন্যকে ধেনো গোছ দেন। সঙ্গি বাবুদের বরাবর মিছিরি খাইয়া মুখ খারাব হয়েছিল, এখন মুড়ি ভাল লাগবে কেন?’ অথচ মজার কথা হল, এমন ডি-ক্লাস্‌ড দিশিকে ছুড়ে ফেলা তো দূরস্থান, জাপটে ধরে রাখতেই বাধ্য হয়েছে সেই বাঙালি ও তার প্রভু ইংরেজ। কত ধানে কত ধেনো বেমালুম বুঝেছিলেন কর্নওয়ালিস। তাই ১৭৯০ সালে তিনি দেশের আবগারি আইন ঢেলে সাজাচ্ছেন। তার পর দেশি আরক থেকে রাজস্ব আদায়ে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিচ্ছে বেঙ্গল। ১৮০৪ সালে সেই পথই মানতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বোম্বে গভর্নমেন্টকে। শুধু আজকের আবগারি দফতর নয়, সেই উনিশ শতক থেকেই এ রাজ্যে দেশি মদ কী ভাবে রাজকোষ ভরিয়ে আসছে, তার হিসেব দেখলে চমকে উঠতে হয়। ১৮৮৮-তে প্রকাশিত মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে লেখা ‘সুরাপান বা বিষপান- **A HAND BOOK OF TEMPERANCE**’ বই থেকে পাওয়া যাচ্ছে ১৮৮৫-’ ৮৬ সালের চিত্র। তখনও এ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি আবগারি আয় হচ্ছে দেশি মদ থেকেই- ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার ২২৮ টাকা। পৃথক কলকাতার ক্ষেত্রেও আয়ের তালিকায় সে বছর সবচেয়ে উপরে দেশি মদই- ৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৩৭ টাকা। গোটা রাজ্যে তখন দেশি মদের দোকান মোট ৪ হাজার ২০৪টি। আরও বলা হচ্ছে- ‘এক্সাইজ কমিশন স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গ দেশে তের জনের মধ্যে একজন দেশী মদ খায়।’ আলাদা ভাবে সে সময় কলকাতায় দিশির হার ছিল এর চেয়েও বেশি- প্রতি চার জনে এক জন!

মিথ্যে যে তিন প্রকার- মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে ও পরিসংখ্যান- বাংলা মদের এই হিসেব সম্ভবত সে কথাই পুনরায় প্রমাণ করে। নইলে শহর কলকাতার ঘরে ঘরে অজস্র মদ্যপায়ী বাংলার কথা শুনলেই নাক সিঁটকোবেন কেন? কর্পোরেট ম্যানেজারটিকে বিড়ি অফার করলে তিনি যেমন অস্বস্তিতে পড়েন আর কী! এটা স্বাদ বা অভ্যাসের প্রশ্ন না, শেষমেশ রুচির প্রশ্নেই এসে দাঁড়ায়। আজ মফস্সল শহরেও দেখছি, পাড়ায় বিলিতির দোকানটিতে ঢুকে প্রকাশ্য দিবালোকেই অনেকে লিটার বা নিপ তুলে আনছেন স্মার্টলি, কিন্তু বাংলার দোকানে পা রাখতে হলেই অস্বস্তি তাঁকে গ্রাস করছে। ‘ই বাবা, তুমি বাংলা খাও!’ -কাউকে বাংলা খেতে দেখলে এমন ঘেন্না-মেশা বিস্ময় যেন অন্যের মুখে ফুটে

উঠবেই। তখন আর ‘বাংলা’ নয়, তার হ্যাটাসম্পৃক্ত নামও হয়ে যাবে ‘বাংলু’। একদা বাংলারই কাস্টমার, অগ্রজ বন্ধু অনিবার্ণ ভট্টাচার্য বেশ কয়েক বছর প্রাগ-এর বাসিন্দা, তাঁর সঙ্গে সবিস্তার আলোচনায় জেনেছি, চেক রিপাবলিকের ব্রিউয়ারি আন্তর্জাতিক ভাবেই ঈর্ষণীয়। অথচ সেখানেও ঘরে বানানো স্নিভোভিত্জ বা স্থানীয় মদ আবসাঁদ নিয়ে এমন শ্রেণিগত ছুঁতমার্গ নেই। যে খায়, সে খায়... যে খায় না, খায় না! কিন্তু বাংলার সাম্প্রতিক এই ভোলবদল কি পায়ী বঙ্গবাসীর নাক-উঁচু মানসিকতার আদৌ কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারল? নাকি কেবল সেই বাংলাই ইভাপোরেট করল, রাখা নাচল না।

মনে হয় না ছবিটা বদলাচ্ছে, কিন্তু এতটা মার্জিনাল হয়ে পড়া কি বাংলার ভবিতব্যে উচিত ছিল? কালীর উপাসনায় শাক্তরাও তো বাংলাকে কম পেট্রনাইজ করেননি। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের শুরুতে আচমনই তো হয় মদ্য দিয়ে; স্বভাবতই তা দেশি মদ। নিয়ম মতে তার একটি বিকল্প ব্যবস্থাও অবশ্য আছে, তা হল কাঁসার বাটিতে গুড় ও আদা মিশিয়ে তা কোষার জলে গুলে নেওয়া। এই পদ্ধতি আসলে মোলাসেস-জাত মদকেই প্রতীকায়িত করে। এ সবেই সূত্রে বঙ্গদেশের মা-ঠাকুমাও এক দিন কী ভাবে দেশি কারণবারিতে চুমুক দিতেন, মেয়েবেলার অভিজ্ঞতা থেকে তা লিখেছেন ঠাকুরবাড়ির বউ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী- ‘... আমারও যখন কিছু পাবার ইচ্ছে হত, তখন ওই জোড়া পাঁঠা আর মদ

মা-কালীর কাছে মানতুম। আমাদের বাড়ির কাছেই এক কালীমন্দির ছিল। কারও মানসিক পূর্ণ হলে, কারও আরোগ্যলাভ বা মোকদ্দমায় জিত এইরকম কোনও কারণ ঘটলে, তাঁরা সেখানে পাঁঠা পাঠিয়ে দিতেন ও মদ নিয়ে যেতেন। এইরকম কোনও উপলক্ষে দেখেছি পাড়ার কতকগুলি বৃদ্ধা নিজেরা মদ ও শুদ্ধি (পাঁচ রকমের ভাজা) নিয়ে কালীমন্দিরের ভিতরে যেতেন। ... মা-কালীর হাতে একটা ছোট পাতলা পিতলের বাটি থাকত, পুরাত ঠাকুর প্রথমে সেই পাত্রটিতে মদ ঢেলে দিতেন। তারপরে কুমারী-কন্যা বলে সকলের আগে আমার হাতে ওইরকম একটা ছোট বাটিতে মদ দিতেন...’ (‘আমার জীবনকথা’)। এ ভাবেই ক্রমশ বাংলা মদ ‘কালীমার্ক’, ‘তারামার্ক’ হয়ে উঠেছিল। যে সংস্কারবশে অনেকে আজও পানের আগে এক বার অন্তত তরলে লালজবা ছুঁইয়ে নেন। কমলকুমার যেমন সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের নাম লেখা হাতের আংটিটি গেলাসে স্পর্শ করে নিতেন। কিংবা তান্ত্রিক রীতির রেশ ধরেই কেউ বা প্রথম ঢোকের আগে মেঝেতে এক ফোঁটা উচ্ছ্বল করেন। বাংলার এই কালী-মার্কামারা ইমেজ এতটাই রয়ে গিয়েছে যে দেখি, দুর্গাপ্রতিমার সামনেই ‘অনুসন্ধান’-এর অমিতাভ যখন মদ্যপ আমজাদকে কেন্দ্র করে ঘুরে ঘুরে নাচেন, নেপথ্যে কিশোরকুমারের গানে শক্তির অনুষ্ণুই উঠে আসে- ‘ব্যাটা চণ্ডী পড়ে কাছা এঁটে, কপালে কালীমার্ক লেবেল সঁটেছে...’!

এই আস্তিক্যবাদ কি আর শুধু জগজ্জননীর জন্য, বঙ্গমাতার জন্যও বটে। খা না-খা, স্নেহ এমন একটা জাতিবোধ-গোলা নামের কারণেই তো অ্যাট লিস্ট বাংলা নিয়ে গর্ববোধ করা উচিত ছিল! আর কোন প্রতিশ্রুতি পাবি রে এমন-ধারা স্থানীয় পানীয়! বাংলা আমার তৃষ্ণার জল, তৃপ্ত শেষ চুমুক। ‘বাংলা’ তো কোনও ব্র্যান্ড নয়, একটা হয়ে-ওঠা উচ্চারণ। তবে কিনা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি তো ছেলেবেলা থেকেই তার বাংলা পরীক্ষার খাতাতেও সাবজেক্ট লেখে : ‘বেঙ্গলি’! বাংলাদেশেও একটি

বাজারের ব্যাণ্ড হল ‘বাংলা’, ভাষা দিবস উপলক্ষে কিন্তু প্রকাশিত হয় তার বিশেষ বিজ্ঞাপন। বেশ ক’ বছর আগে গৌতম ঘোষ তাঁর ‘দেখা’ ছবিতে শুনিয়েছিলেন পানপাত্র ঠুকে ‘উল্লাস’ ধ্বনি- আমরা অবশ্য আজও গ্লাসে-গ্লাসে তুফান তুলি সেই কলোনিয়াল ‘চিয়ার্স’-এই। মনে রাখা দরকার, পুরুলিয়ার আদিবাসীরা কিন্তু মজার পাত্রে ঠোঁট ঠেকাবার সময় ‘চিয়ার্স’ বলেন না, নিজেদের দেবতাকে স্মরণ করে বলে ওঠেন ‘জোহর মারাংবুরু’। বাংলায় সম্পৃক্ত নিজের এই অস্তিত্বকে আসলে আমরা খুঁজতেই চাইনি। কিংবা এমন কোহল-সন্ধান হয়তো বড্ড জোলো ঠেকেছে চিরকাল, আজকের বিলিতি হতে চাওয়া বাংলার মতোই। তবে ব্যাপার হল গিয়ে, সেই উনিশ শতক টু একবিংশ, ভিতর-বাহিরে অন্তরে-অন্তরে বদলে যেতে থাকা যে আলোকপ্রাপ্ত বাঙালিসমাজ, তাদের নিয়ে ফোঁটামাত্র মাথাব্যথা নেই বাংলার আসলি গুণগ্রাহীদের। তাঁরা এ সবার পরোয়াটুকু করেন না। বঙ্গবালার দেখা পেলে আজও তাঁরা কেউ বাংলার গেলাস হাতে বলতে পারেন- ‘আমার হাতে সুধা আছে, চাও কি?’ সত্তর দশকের ‘ক্ষয়ে যাওয়া পচে যাওয়া ফুরিয়ে যাওয়া নিম্ন-মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্বজ্ঞানহীন মাতাল প্রতিনিধি’ নীলকণ্ঠ বাগচি সেই কবে শিভাস রিগ্যাল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, গায়ের লোম উঠে যাবে বলে। ২০১৩-র মেঘে ঢাকা অ্যাসাইলামেও দেখছি তাঁর ওই দু-বোতল বাংলাই লাগছে। ‘সেক্ষেত্রে একটু সাহস সঞ্চয় করে’ নিতে যে এখনও বাংলার বোতলেই মুখ ঠেকানো যায়, তা মুচি-মেথর-টোটোওয়ালারা ফিল্ম সোসাইটি না-করেও বিলক্ষণ জানেন। এইখানে ওই থিয়োরি-থিয়োরি কঠিন ভাষায় বললে বলতে হয়: প্রোলেতারিয়েত অস্তিত্বকে পুঁজি করে বাংলা বহু দিনই হয়ে উঠেছে অ্যান্টি এস্টাব্লিশমেন্ট-এর অন্যতম আধেয়। আধারও বটে। কারণ হাতে-গোনা হলেও কিছু মানুষ তো এমনও আছেন, যাঁরা হেলায় স্কচ খেতে পারলেও, ঘুরে-ফিরে তবু সেই বাংলাই খান। বাংলা... আমার স্বপ্নলোকের চাবি, বাংলায় পাই পৃথিবীর পরিচয়। বাংলার প্রতি এই টান আসলে একটা স্টেটমেন্ট। রাজনৈতিক বিবৃতি। কাব্যের সঙ্গে স্লোগান মিশিয়ে যাকে পুরন্দর ভাট লেখেন- ‘বাংলা ডিস্টিলারি / গড়ো ঘরে ঘরে / বাঙালি মেলাও হাত/ বাংলার তরে’। কিংবা, বিস্ময়-মেশা ‘এ কী, এ কী, দেবানন্দের হিন্দি ফিল্মি ছিলিম কেন বাবা?’ প্রশ্নের উত্তরে কোণঠাসা টালিগঞ্জ যেমন বলে, ‘ভুল হয়ে গেছে, বাংলায় ফিরে এসো বাবা।’ মাসিক ছ’ অঙ্কের এমএনসি ছেড়ে ফিরতি-বিমানে দমদমে পা রেখে দু-এক জনের যে রকম প্রশান্তি জাগে আর কী! জাগো বাংলা। এই ঝরঝর বরিষণ সিঁজনে কামনা করি- আরও পরিশুদ্ধ হও, খাঁটি হও। বিষমুক্ত হও। উপযুক্ত হও। কিন্তু মা কসম, ফর গড’স সেক- অহেতুক জোলো বিলিতি হতে চেয়ো না।